কণিকাগুলো যতই ঘন মাধ্যমটির পৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে আসে এরা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হবে এবং ফলে আলোক কণিকাগুলো ঘন মাধ্যমটির ভেতরে দ্রুততর বেগে ধাবিত হবে। আর মাধ্যমটি কণিকাসমূহের গতিপথের দিক পরিবর্তন ঘটাবে অভিলম্বের দিকে। ফলে গতিপথের সাথে অভিলম্বের কোণ (প্রতিসরণ কোণ) হ্রাস পায়। আলোর প্রতিভাস নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা ও পরীক্ষণ বিশ্লেষণ নিয়ে নিউটন রচনা করেছিলেন আলোক গ্রন্থ 'অপটিকস' (Opticks) ১৭০৪ সালে। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আলোর প্রতিফলনের নিয়ম ইউক্লিডেরও জানা ছিল, আর প্রতিসরণের নিয়ম পরীক্ষণের মাধ্যমে উইলবার্ড স্নেল (Wilebrod Snell : 1591-1626) আবিষ্কার করেছিলেন। নিউটন ব্যর্থ হলেও প্রাচীনতর কণিকা তত্ত্ব প্রয়োগ করে ১৬৩৭ সালে রেনে দেকার্তে (Rene Descartes : 1596 - 1650) স্নেলের প্রতিসরণ নিয়ম, যা ফরাসী দেশে দেকার্তের নিয়ম নামে পরিচিত আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিউটন এ তথ্য জানতেন কিনা জানা যায়নি।

নিউটনের দ্বিতীয় বিখ্যাত 'অপটিকস' গ্রন্থটিও আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ করে পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যায় প্রভূত অবদান রেখেছে। এটি তৎকালে বহুল আলোচিত প্রতিফলন ও প্রতিসরণ বিষয়ক জ্যামিতিক আলোক বিদ্যা সংক্রান্ত কোনও ঐতিহ্যিক পুস্তক নয়। বস্তুত নিউটনের এ ধরনের গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আলোর প্রকৃতি নিয়ে- আলোর প্রকৃতিকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোর নানা সমস্যা নিয়ে সম্পাদিত নানা পরীক্ষণের বিবরণ এতে স্থান পেয়েছে। পরীক্ষণের মধ্যে রয়েছেঃ আলোর বিচ্ছুরণ (dispersion) অর্থাৎ সাদা আলোকে বিভিন্ন উপাংশে বিশ্লিষ্টকরণ; আলোর ব্যতিচার (interference) ও বিক্ষেপণ (diffraction), নিউটন যার নাম দিয়েছিলেন 'অন্তর্বক্রতা' (inflexion) অর্থাৎ আলোর ভেতরের দিকে বেঁকে যাওয়া। প্রিন্সিপিয়া ও অপটিকসের মধ্যে উপস্থাপনা পদ্ধতিতে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। প্রথমত প্রিন্সিপিয়া লেখা হয়েছিল ল্যাটিনে, আর অপটিকস ইংরেজি ভাষায়। প্রিন্সিপিয়া'র উপস্থাপন পদ্ধতি ছিল জ্যামিতিক, অর্থাৎ পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছিল প্রতিজ্ঞাসমূহকে ভিত্তি করে; এসব প্রতিজ্ঞা গাণিতিক পন্থায় প্রমাণিত পূর্ব প্রতিজ্ঞাসমূহ, লেমা অথবা স্বতঃসিদ্ধসমূহ থেকে উৎক্ষরিত। অন্যদিকে অপটিকসে রেকর্ডকৃত সিদ্ধান্তসমূহে নিউটন উপনীত হয়েছিলেন পরীক্ষণ পদ্ধতিতে- এখানে প্রতিজ্ঞা, সমীকরণ বা গাণিতিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরীক্ষণের মাধ্যমে। এককথায় প্রিন্সিপিয়া যদি তত্ত্বীয় পদার্থবিদের হয়ে থাকে পথনির্দেশক, তাহলে অপটিকস পরীক্ষণ পদার্থবিদের জন্য হতে পারে একটি উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা।

অপটিকসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বেশ কিছু "জিজ্ঞাসা" (queries)। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ সমাহার- যেমন উদাহরণস্বরূপ তাপশক্তির প্রকৃতি ও পরিচালন; মাধ্যাকর্ষণের সম্ভাব্য কারণ; রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি; সৃষ্টির মুহূর্তে (beginning) ঈশ্বর কোনও প্রক্রিয়ায় 'জড়' (matter) সৃষ্টি করেছিলেন - যার উত্তর হকিংসহ আধুনিক পদার্থবিদগণ খুঁজে ফিরছেন; এমনকি মানুষের নৈতিক আচরণ ... ইত্যকার নানা প্রশ্ন। এই জিজ্ঞাসাগুলো কিন্তু নিছক প্রশ্ন নয়, বস্তুত এসব প্রশ্ন তুলে তিনি এসব সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নগুলো উত্থাপনের শৈলীর মধ্য দিয়েই তিনি কি বলতে চান তার ইঙ্গিত থাকে। যেমন নিউটন প্রশ্ন করেন না আলো বস্তু কণিকা নয় কি না? বরং তিনি প্রশ্নটিকে এভাবে উত্থাপন করেন, 'আলো কি বস্তু কণিকা নয়?' এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিউটন এক ধরনের 'উদ্ভাবনীমূলক প্রাকৃতিক দর্শন' (Exploratory natural philosophy) প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন– যেখানে জ্ঞানের মুখ্য উৎস হবে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষণভিত্তিক প্রাকৃত দর্শনের এই নিউটনীয় ঐতিহ্য গাণিতিক পদ্ধতি ভিত্তিক প্রাকৃত দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। এই অর্থে অপটিকস গ্রন্থটি এক ধরনের নিউটনীয় মতবাদ (Newtonianism) প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যা অষ্টাদশ শতাব্দিতে গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে প্রিন্সিপিয়া'র 'গাণিতিক প্রাকৃত দর্শনের' (Mathematical natural philosophy) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ব্যতিচার (interference), অপবর্তন (diffraction), সমাবর্তন (polarization) জাতীয় আলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু প্রতিভাসের 'আলোর প্রকৃতি তরঙ্গ' এই অনুকল্প ব্যতিরেকে সুচারু ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, নিউটনের জন্মের ৩৬ বছর পরে ওলন্দাজ পদার্থবিদ খ্রিস্চিয়ান হুইগেনস (১৬২৯-১৬৯৫) ১৬৭৮ সালে আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব ধারণা করে যে আলো হলো এক ধরনের তরঙ্গ, কণিকার স্রোতধারা নয়- যা নিউটন প্রস্তাব করেছিলেন। সেকালে এ দু'টি তত্ত্ব ছিল পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। হুইগেনস আলোর তরঙ্গ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নি, তরঙ্গের মাধ্যম সম্বন্ধেও ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। আলো কী অনুদৈর্ঘ্য না অনুপ্রস্থ তরঙ্গ প্রকৃতির সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না। এমনকি দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা আলোর দ্রুতি সম্পর্কেও কোনও জ্ঞান ছিল না। বস্তুত ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক আলোর 'তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ' তত্ত্বের উত্থাপনের আগ পর্যন্ত এক শতাব্দী ধরে আলোর মাধ্যম হিসেবে হুইগেনস পরবর্তী পদার্থবিদরা কল্পনা করেছিলেন অপার্থিব 'ঈথর'র অস্তিত্ব। তবে হুইগেনসের সাফল্য হলো, তিনি সার্থকভাবে তার তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে আলোর সরল রৈখিক গতি, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটনার চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। হুইগেনস তত্ত্বের ভিত্তি ছিল জ্যামিতিক গড়ন - যার সাহায্যে বলা যেত যে একটি প্রদত্ত 'তরঙ্গ মুখ' (wave front) ভবিষ্যতের কোনও এক মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করবে, বর্তমান অবস্থানের সাপেক্ষে। তার এই জ্যামিতিক গড়ন নীতি পরবর্তী সময়ে হুইগেনসের নীতি (Huygens' principle) নামে পরিচিতি লাভ করে। ফুকো (Foucault) ১৮৫০ সালে সুনিশ্চিতভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে, আলো বাতাস অপেক্ষা জলে ধীর বেগে চলে; এর ফলে নিউটনের কণিকা তত্ত্বের ভিতটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে পদার্থবিদদের কাছে এর গুরুত্ব চিরতরে হারিয়ে যায়।

কণিকা তত্ত্বের সহায়তায় ব্যতিচার ঘটনার সার্থক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব না হলেও, ১৮০১ সালে থোমাস ইয়ং পরীক্ষণের মাধ্যমে আলোর ব্যতিচার প্রতিভাস সৃষ্টি করে আলোর তরঙ্গ তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দু'টি সংসক্ত আলোর উৎস থেকে নির্গত দু'টি একবর্ণী আলোক রশ্মি এমনভাবে মিলিত হতে পারে যাতে শক্তির (আলোর তীব্রতা) স্থানিক বণ্টন সুষম না হয়ে, কোনও বিন্দুতে আলোর তীব্রতা সর্বোচ্চ, আবার অন্য বিন্দুতে সর্বনিম্ন, এমনকি শূন্যও হতে পারে। আলোর এ ধরনের প্রতিভাসকে বলা হয় ব্যতিচার।

আলো যখন কোনও আয়তাকার অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চলে যায় তখন এর পার্শ্বের কাছাকাছি অঞ্চলে আলো তার সরল রৈখিক পথ ছেড়ে বেঁকে যায়; আলোক পথের এই বেঁকে যাওয়াকেই পদার্থবিদরা বলে থাকেন আলোর অপবর্তন (diffraction of light)। অপবর্তন ঘটনা সর্বপ্রথম অবলোকন করেছিলেন ফ্রানসেস্কো মারিয়া গ্রিমালদি (Francesco Maria Grimaldi ঃ ১৬১৮-১৬৬৩) এবং তা হুইগেনস ও নিউটন উভয়েরই জানা ছিল। হুইগেনস তরঙ্গ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেও বিশ্বাস করতেন না যে, আলোক পথে স্থাপিত কোনও বাধা অপবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, আর নিউটনের কাছে অপবর্তন ঘটনা ছিল নেহাৎ তাৎপর্যহীন, যাকে তরঙ্গ তত্ত্বের পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে উত্থাপন করা যেতে পারে। এ. জে. ফ্রেনেল (A. J. Fresnel : 1788-1827) প্রথম সার্থকভাবে হুইগেনসের নীতিকে প্রয়োগ করেছিলেন অপবর্তনের সুচারু ব্যাখ্যায়।

পরিশিষ্ট ৪. প্রিন্সিপিয়া'র কাহিনী

কেম্ব্রিজে ফিরে নিউটন বস্তুর গতি-প্রকৃতি নিয়ে তার পূর্বসুরি গ্যালিলিও ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণাগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে প্রকাশিত হলো ১৬৮৭ সালে নিউটনের বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি আধুনিক বলবিজ্ঞানের বাইবেল 'Phnlosophiae Naturalis Principia Mathematica'। মাত্র তিনটি নিয়মের মধ্যদিয়ে তিনি বলবিজ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তিকে বেঁধে ফেলেছিলেন। গ্যালিলিওর কালের আগ পর্যন্ত জ্ঞানী দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, কোনও বস্তুকে চলমান রাখতে হলে ওই বস্তুটির উপর এক ধরনের প্রভাব (influence) বা বল (force) সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। ধারণা করা হতো যে বস্তুটির 'স্বাভাবিক অবস্থা' (natural state) হলো তার স্থির অবস্থা (state of rest)। গ্যালিলিওই পরীক্ষণের মাধ্যমে এ ধারণার পরিবর্তন করান এবং গুণবাচকভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে বাধাগ্রস্ত না হলে সরল রেখায় চলমান বস্তু চলতেই থাকবে। গ্যালিলিও আরও বলেছিলেন যে, কোনও বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটাতে বহির্বলের প্রয়োজন,